গণেশ মুৎসুদ্দির পোর্ট্রেট

সুখময় সেনের বয়স পঁয়ত্রিশ। এই বয়সেই সে চিত্রকর হিসাবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে। পোর্ট্রেটেই তার দক্ষতা বেশি। সমঝদারেরা বলে সুখময় সেনের আঁকা কোনো মানুষের প্রতিকৃতি দেখলে সেই মানুষের জ্যান্ত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। বহু প্রদর্শনীতে তার আঁকা পোর্ট্রেট দেখানো হয়েছে, শিল্প সমালোচকেরা তার প্রশংসা করেছে।

কিন্তু শিল্পীরা সবসময় এক পথে চলতে ভালোবাসে না। সুখময়ও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নয়। সম্প্রতি তার মনে হয়েছে—পোর্ট্রেট তো অনেক হল, এবার একটু অন্য ধরনের কিছু আঁকলে কেমন হয়। এই অন্য ধরনটা সুখময়ের ক্ষেত্রে হল ল্যান্ডস্কেপ বা প্রাকৃতিক দৃশ্য। এই প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার উদ্দেশ্যেই সুখময় হাজির হয়েছে শিলং শহরে।

সুখময় এখনো বিয়ে করেনি, তার বাপ মা দুজনেই জীবিত। দুটি বোন আছে, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। সুখময় শিলং-এ একাই এসেছে, কারণ শিল্পীর একাকিত্বের প্রয়োজনীয়তা সে প্রবলভাবে অনুভব করে। যখন সে ছবি আঁকে তার পাশে কেউ উপস্থিত থাকলে সেটা সে মোটেই পছন্দ করে না। অবিশ্যি পোর্ট্রেট আঁকা হলে যার ছবি আঁকা হচ্ছে তাকে থাকতেই হয়, কিন্তু আর কেউ নয়। সব শিল্পীর মধ্যেই এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়, কিন্তু সুখময়ের মধ্যে এর মাত্রাটা একটু বেশি।

তাই শিলং-এ এসে সেখানকার বিখ্যাত লেকের ছবি সে যখন আঁকছিল ঘাসের উপর ইজেল রেখে, তখন একটি দ্বিতীয় প্রাণীর আবির্ভাবে সে মোটেই সন্তুষ্ট হল না।

'বাঃ, আপনার আঁকার হাত তো খাশা মশাই!' হল আগন্তুকের প্রথম মন্তব্য।

suman_ahm@yahoo.com

এর কোনো উত্তর হয় না, তাই সুখময় স্মিতহাস্য করে তার তুলি চালিয়ে চলল।

'আমি চিত্রকরদের খুব উঁচুতে স্থান দিই', বললেন আগন্তুক। 'একজিবিশনে যাই সুযোগ পেলেই। আপনার কি কখনো কোনো প্রদর্শনী হয়েছে ?'

এটা একটা প্রশ্ন, কাজেই এর উত্তর দিতে হয়। সুখময় সংক্ষিপ্ততম উত্তরটি বেছে বলল, 'হ্যাঁ।'

'আপনার নামটা জানতে পারি কি ?'

সুখময় নাম বলল।

আগন্তুকের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'বলেন কি মশাই! আপনার নাম তো আমার বিলক্ষণ জানা। আমি যতদূর জানি আপনি তো ল্যান্ডস্কেপ আঁকেন না। আপনার ছবির প্রদর্শনীতে আমি গিয়েছি। সেগুলো সবই পোর্ট্রেট। আপনি হঠাৎ সাবজেক্ট চেঞ্জ করলেন কেন ?'

'স্বাদ বদলের জন্য।' বলল সুখময়। এ ভদ্রলোক তার পাশ সহজে ছাড়বেন বলে মনে হয় না। সুখময় অভদ্রতা এড়ানোর জন্য বাধ্য হয়েই প্রশ্নটা করল।

'আপনি কি শিলং-এই থাকেন ?'

'আজ্ঞে না। আমার এক শালা থাকে লাবানে, আমি তার বাড়িতে দিন দশেকের জন্য এসে উঠেছি। আমার নাম গণেশ মুৎসুদ্দি। কলকাতায় থাকি ; একটা ইনশিওরেন্স কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।'

সুখময় যে এতক্ষণ এই ভদ্রলোককে বরদাস্ত করেছে তার একটা কারণ হল এই যে ভদ্রলোকের চেহারায় বেশ একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, কণ্ঠস্বরও ভালো, নাক চোখা, চাহনি বুদ্ধিদীপ্ত। এই রকম চেহারা দেখলে আপনা থেকেই সুখময়ের পোর্ট্রেট করার ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

'তা আপনি কি মানুষের ছবি আঁকা ছেড়ে দিলেন ?' গণেশ মুৎসুদ্দি প্রশ্ন করলেন।

'পোর্ট্রেট তো অনেক হল,' বলল সুখময়, 'তাই এবার ল্যান্ডস্কেপের দিকে ঝুঁকেছি।'

'আপনি আমার একটা ছবি এঁকে দেবেন ?'

সুখময় রীতিমতো বিস্মিত। এ ধরনের প্রস্তাব ভদ্রলোকের কাছ থেকে সে আশা করেনি। গণেশ মুৎসুদ্দি ঘাসের উপর বসে পড়ে বললেন, 'আমি একটা অভিনব অফার দিচ্ছি আপনাকে। আপনি পোর্ট্রেট আঁকবেন, তবে সাধারণ পোর্ট্রেট নয়।'

'কী রকম ?'

সুখময়ের মনে এখন বিরক্তির জায়গায় কৌতূহল দেখা দিয়েছে। তার

হাতের তুলি হাতেই রয়ে গেছে ; সে তুলি আর কাজ করছে না ।

গণেশ মুৎসুদ্দি বললেন, 'আমার প্রস্তাবটা শুনুন, তারপর আপনার যা বলার বলুন। আমার মনে হয় এটা আপনি উড়িয়ে দিতে পারবেন না।'

সুখময় এখনও কোনো আন্দাজ করতে পারছেন না ভদ্রলোক কী বলতে চান। ভদ্রলোকও একটু সময় নিয়ে তাঁর প্রস্তাবটা দিলেন।

'ব্যাপারটা হল এই—আপনি আমার একটা ছবি আঁকুন, কিন্তু সেটা হবে এখনকার চেহারা নয়। আজ থেকে ঠিক পঁচিশ বছর পরে আমার যে চেহারা হবে সেইটে আপনার অনুমান করে আঁকতে হবে। আজ হল ১৫ই অক্টোবর ১৯৭০। আপনার ছবিটা আমি উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে আপনার কাছ থেকে কিনে নেব। তারপর আজ থেকে পঁচিশ বছর পরে—অর্থাৎ ১৫ই অক্টোবর ১৯৯৫—আমি আবার ছবিটি নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব। আমার কথার নড়চড় হবে না। যদি দেখা যায় যে আপনার অনুমান ঠিক হয়েছে এবং ছবির সঙ্গে আমার তখনকার চেহারা মিলে গেছে, তাহলে আমি আপনাকে আরো কিছু টাকা পুরস্কার দেব। রাজি ?'

প্রস্তাব যে অভিনব তাতে সন্দেহ নেই। এমন প্রস্তাব কোনো ব্যক্তি কোনো শিল্পীকে করেছে বলে সুখময়ের জানা নেই। সুখময় প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিতে পারল না। এটা একটা চ্যালেঞ্জই বটে। একজন লোকের আজকের চেহারা পঁচিশ বছরে কী রূপ নেবে সেটা অনুমান করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ; কিন্তু তাও সুখময় একটা আকর্ষণ অনুভব করল। সে বলল, 'ছবি না হয় আমি আঁকলাম, কিন্তু পঁচিশ বছর পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হবে কী করে ?'

'আমিই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব,' বললেন গণেশ মুৎসুদ্দি। 'আপনার এখনকার ঠিকানা আপনি আমাকে দিন, আমিও আমার ঠিকানা দিচ্ছি। যার ঠিকানা বদল হবে সে অন্যকে জানাবে। এই ব্যাপারে যেন অন্যথা না হয়, নইলে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এই ভাবে ঠিক পঁচিশ বছর পর আপনার পোর্ট্রেটটি সঙ্গে নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব। যদি চেহারা মেলে তাহলে আপনি আরো পাঁচ হাজার পাবেন ! না হলে অবশ্য টাকার আর কোনো প্রশ্ন উঠছে না ; কিন্তু এটাও বুঝুন যে আপনার কোনো লোকসান হচ্ছে না, কারণ আপনার পারিশ্রমিক আমি এখনই দিয়ে দিচ্ছি।'

সুখময় একটু ভেবে বলল, 'আমি রাজি আছি। শিলং-এই কাজটা হবে তো ?'

'তা তো হতেই পারে। আমি এখানে আরো দশদিন আছি, তার মধ্যে আপনার পোর্ট্রেট হয়ে যাবে না ?'

'পোর্ট্রেট করতে দিন পাঁচেকের বেশি লাগবে না। আমি আরো সাতদিন

আছি। কালই শুরু করা যাবে তো!'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু এমন উদ্ভট প্ল্যান আপনার মাথায় এল কী করে?'

'আমি মানুষটাই একটু রগুড়ে আর খামখেয়ালি। আমাকে যারা চেনে তারা আমার এদিকটা জানে। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়নি তাই আপনার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে।'

'আপনার বয়স এখন কত?'

'সাঁইত্রিশ। পঁচিশ বছর পরে আমার বয়স হবে বাষট্টি। আপনি তো বোধহয় আমার চেয়ে ছোট?'

'আমার বয়স পঁয়ত্রিশ,' বলল সুখময়। 'আশা করি আমরা দুজনই আরো পঁচিশ বছর জীবিত থাকব।'

'সেটা কি জোর দিয়ে কেউ বলতে পারে?'

'আমার মন তাই বলছে। তারপর দেখা যাক কী হয়।'

'তাহলে কাল থেকেই কাজ শুরু।'

'হ্যাঁ। আপনি যদি বলেন তাহলে আমি আপনার বাড়িতে আসতে পারি।'

'আঁকার সরঞ্জাম—রং, তুলি, ক্যানভাস, ইজেল—সেখানে পাওয়া যাবে! আমি থাকি লাইমখ্‌রা—বাংলো বাড়ি, নাম "কিসমৎ"। এখানে সকলেই ওটাকে স্মিথ সাহেবের বাংলো বলে।'

গণেশ মুৎসুদ্দির আজ থেকে পঁচিশ বছর পরের পোর্ট্রেট আঁকতে সুখময় সেনের লাগল পাঁচ দিন। ছবিটা এঁকে সুখময় বুঝেছে যে এমন চিত্তাকর্ষক কাজ সে কোনোদিন করেনি। অন্য পোর্ট্রেট আঁকতে শুধু পর্যবেক্ষণেরই প্রয়োজন হয়, এ ক্ষেত্রে একটা দূরদৃষ্টি সুখময়ের সব সময়ই প্রয়োগ করতে হচ্ছিল যেটা এর আগে কখনই প্রয়োজন হয়নি। গণেশ মুৎসুদ্দির মাথা ভর্তি চুল, কিন্তু সুখময় লক্ষ করেছে যে সে চুলের জাত পাতলা। তাই পঁচিশ বছর পরে তার মাথায় একটা বিস্তীর্ণ টাক দিয়েছে সুখময়। তাছাড়া সুখময়ের মন বলেছে এ ব্যক্তি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মোটা হবে না, রোগাই থাকবে। তাই ছবিতে মুখের ভাবটা শীর্ণ করেছে। গাল বসা, চোখের কোণে বলিরেখা, কানের পাশে চুলে পাক, থুৎনির নীচে ঈষৎ লোল চর্ম—এই সবই সুখময় এঁকেছে। তাছাড়া ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস দিয়েছে। কারণ তার মন বলেছে গণেশ মুৎসুদ্দির জীবনটা মোটামুটি সুখের হবে।

ছবি দেখে গণেশ মুৎসুদ্দি বললেন, "বাঃ, এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। কিছুটা আমার বাবার এখনকার চেহারার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আর মনে হয় আমাকে মেক-আপ দিলেও এই চেহারা দাঁড় করানো যায়। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আবার পঁচিশ বছর পরে দেখা হবে, আপাতত আপনার পারিশ্রমিকটা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

শিলং লেকের ছবি শেষ করার জন্য সুখময়কে আরো কদিন থাকতে হয়েছিল। কিন্তু এ কদিনে আর গণেশ মুৎসুদ্দির সঙ্গে দেখা হয়নি। লোকটা যে ভারী অদ্ভুত এ চিন্তা সুখময়ের মনে অনেকবার উদয় হয়েছে। পঁচিশ বছর পরে কি সে সত্যিই আবার আসবে ? সেটা বলার কোনো উপায় নেই। এই পঁচিশ বছরে কত কী ঘটতে পারে এটা ভেবে সুখময়ের মাথা ভোঁ ভোঁ করে উঠল।

সুখময় সেন পোর্ট্রেট এঁকে যেমন নাম করেছিল, ল্যান্ডস্কেপ এঁকে তেমন করেনি। সমালোচকের মন্তব্য তাকে পীড়া দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে তার কিছুটা সে না মেনেও পারেনি। দৈনিক বার্তা কাগজের চিত্রসমালোচক অম্বুজ সান্যাল সুখময় সেন সম্পর্কে একটি দীর্ঘ আলোচনায় অনুযোগ করলেন যে প্রাচীন পথ ধরে চলাই হচ্ছে সুখময়ের উদ্দেশ্য। অথচ তার তুলির জোর আছে। রঙের উপর দখল আছে, টেকনিকে সে দক্ষ ; তাহলে সে পুরনো পথ ছেড়ে আজকের রীতি অবলম্বন করবে না কেন ? আর্ট তো চিরকাল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না ; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রীতিনীতি পরিবর্তন হয়। সুখময়কে মডার্ন হতেই হবে। নইলে তার কাজে অবসাদের ছায়া আসতে বাধ্য।

১৯৭৫-এর মে মাসের প্রদর্শনীতে সুখময়ের নতুন ঢং-এর কাজের নমুনা দেখা গেল। দু'একজন সমালোচক প্রশংসা করলেন বটে, কিন্তু ছবি বিক্রী হল না। অথচ সুখময় পেশাদারী চিত্রকর, ছবি এঁকেই তাকে পেট চালাতে হয়।

এদিকে গোলমাল যা হবার তা হয়ে গেছে। মডার্ন আর্ট করতে গিয়েই সুখময়ের কাল হল। জীবনে সে প্রথম টের পেল অর্থাভাব কাকে বলে। নবীন নস্কর লেনে তার ফ্ল্যাটে তিনখানা ঘরে সে বাস করে। তার সঙ্গে এতদিন ছিলেন তার মা ও বাবা। ১৯৮০-র ডিসেম্বরে সুখময়ের বাপের মৃত্যু হল। মার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও সুখময় বিয়ে করেনি। ভাগ্যিস !—কারণ ১৯৭০-এর সুখময় আর ১৯৮০-র সুখময়ে অনেক পার্থক্য। শিল্পী হিসাবে তার যে আত্মপ্রত্যয় ছিল সেটা সে হারিয়েছে। মডার্ন আর্ট সে এখনও করছে এবং স্বল্পমূল্যে কয়েকটা বিক্রীও হয়, কিন্তু তাতে সংসার চলে না।

১৯৮৫-তে সুখময়কে মাঝে মাঝে ফিল্মের বিজ্ঞাপন আঁকতে শুরু করতে হল। তেলরঙে আঁকা বিরাট বিজ্ঞাপন রাস্তায় টাঙানো হবে ; কে সে ছবি এঁকেছে তা কেউ জানতে চাইবে না। অত্যন্ত হীন জীবিকা, কিন্তু এছাড়া গতি নেই। ফ্ল্যাটের তিনটে ঘরের একটা ভাড়া হয়ে গেল। তাতে এক জ্যোতিষী এসে উঠলেন, নাম ভবেশ ভট্টাচার্য। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল সুখময়ের।

সুখময়ের ভবিষ্যৎ গণনা করে কিন্তু জ্যোতিষী মশাই কোনো আশার আলো দেখতে পেলেন না।

১৯৮৬-র কোনো একটা সময়ে জীবন সংগ্রামের চাপে পড়ে সুখময়ের স্মৃতি থেকে শিলং-এর ঘটনাটা বেমালুম লোপ পেয়ে গেল। এই স্মৃতি লোপ পাওয়ার ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত ; কখন যে সেটা ঘটে তা কেউ বলতে পারে না।

১৯৮৬-তে সুখময়ের মা মারা গেলেন। এখন সুখময় একেবারে একা। তার সুদিনে তার যে কিছু বন্ধু জুটেছিল—প্রণব, সাত্যকি, অরুণ—এরা সকলেই সুখময়ের দুর্দিনে সরে পড়েছে। সুখময়ের বয়স এখন বাহান্ন। এই বয়সেই রাত্তিরের টিমটিমে আলোতে সাইনবোর্ড এঁকে এঁকে তার চোখে ছানির উপক্রম দেখা দিয়েছে। অথচ বাড়িওয়ালার তাগাদা এড়াতে তাকে ক্রমাগত কাজ করে যেতেই হচ্ছে। বাড়িওয়ালা আগে যিনি ছিলেন তিনি মোটামুটি ভদ্র ছিলেন, কিন্তু তিনি মরে গিয়ে তাঁর বড় ছেলে এখন তাঁর স্থান অধিকার করেছেন। ইনি পয়লা নম্বর চামার ; এঁর মুখে কিছু আটকায় না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে গালিগালাজও সুখময়ের গা সওয়া হয়ে গেছে!

সময় কারুর জন্য অপেক্ষা করে না। দেখতে দেখতে ১৯৯৫ সাল এসে পড়ল। সুখময়ের এখন আর একটি কাঁচা চুলও অবশিষ্ট নেই।

অক্টোবরের পনেরই—সেদিন বিজয়া দশমী—সুখময়ের ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। সুখময় দরজা খুলে দেখল—একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক, মাথায় ঢেউ খেলানো পাকা চুল আর নাকের নিচে একটি জাঁদরেল গোঁফ। ভদ্রলোকের হাতে একটি বেশ বড় চতুষ্কোণ খবরের কাগজের মোড়ক, দেখলে মনে হয় হয়তো ছবি আছে। সুখময় ভদ্রলোককে দেখে সন্তুষ্ট হল না। এখন তার অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলার মেজাজ নেই। বাড়ি ভাড়া সাত মাসের বাকি পড়েছে, বাড়িওয়ালা শাসিয়ে গেছেন এবারে মিটিয়ে না দিলে তিনি জোর করে তাকে ঘর ছাড়া করবেন। গুণ্ডার সাহায্যে সবই সম্ভব।

আগন্তুকের মুখে কিন্তু হাসি। ঘরের ভিতরে ঢুকে বললেন, ' ভুলে গেছেন বুঝি ?'

সুখময় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আজ কী তারিখ ?'

'পনেরই অক্টোবর।'

'কী সন ?'

'১৯৯৫।'

'তাও কিছু মনে পড়ছে না ? শিলং-এর সেই ঘটনা বেমালুম ভুলে গেলেন ?'

প্রশ্নটা করতেই—আর হয়তো ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শুনেই—সুখময়ের মনে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এক ঝলকে তার সব কথা মনে পড়ে গেল—কেবল ভদ্রলোকের নামটা ছাড়া।

'মনে পড়েছে', বলে উঠল সুখময়। 'আপনার একটা পোর্ট্রেট করেছিলাম আমি আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে। কিন্তু আমি তো হেরে গেলাম। আপনার মাথা ভর্তি চুল, আপনার গোঁফ, আপনার ঝুলপি এসব তো কিছুই আমি আঁকিনি।'

'আমার চেহারা দেখে কারুর কথা মনে পড়ছে?

এটা সত্যি কথা বটে। ভদ্রলোককে দেখেই সুখময়ের কেমন যেন চেনা লেগেছিল।

'আপনি বাংলা ফিল্ম দেখেন?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'তা দেখি না, তবে বাংলা ছবির বিজ্ঞাপন আঁকি।'

'মণীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামটা চেনা লাগছে কি?'

ঠিক কথা। এই মণীশ গঙ্গোপাধ্যায় নামকরা চলচ্চিত্র অভিনেতা। বয়স হয়েছে, নায়কের অভিনয় করেন না, তবে জাঁদরেল চরিত্রাভিনেতা হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। সুখময় বলল, 'এবার চিনেছি। আপনি ক্যারেকটার রোল করেন। খুব জনপ্রিয় অভিনেতা। আমি ফিল্মের বিজ্ঞাপনে আপনার ছবি এঁকেছি।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'সেটা হল আমার আজকের পরিচয়। মণীশ গঙ্গোপাধ্যায় আমার আসল নাম নয়। আমার আসল নামে আপনি আমাকে চিনতেন পঁচিশ বছর আগে। সে নাম হল গণেশ মুৎসুদ্দি।'

'ঠিক কথা,' বলল সুখময়। 'আমি আপনার একটি পোর্ট্রেট করি—পঁচিশ বছর পরে আপনার যে চেহারা হবে সেটা অনুমান করে। সে ছবির কথা আমার এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে। কিন্তু সে চেহারার সঙ্গে আপনার আজকের চেহারার কোনো মিল নেই। কাজেই আমি কৃতকার্য হইনি। হলে আপনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু সে টাকাও আমি দাবি করতে পারি না। কাজেই—'

'দাঁড়ান, আপনাকে সে ছবিটা দেখাই', বলে ভদ্রলোক মোড়ক খুলে ছবিটা টেবিলের উপর দাঁড় করালেন। তারপর বললেন, 'ভুলবেন না আমি অভিনেতা। এবার দেখুন আমার দিকে।'

সুখময় ভদ্রলোকের দিকে চাইল। ভদ্রলোক এক টানে তার গোঁফ আর মাথার চুল খুলে ফেললেন। সুখময় অবাক হয়ে দেখল তার সামনে হুবহু তার পোর্ট্রেটের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গণেশ মুৎসুদ্দি।

'এটাই আমার আসল চেহারা,' বললেন গণেশ মুৎসুদ্দি। 'এই চেহারা আপনি অদ্ভুত ক্ষমতাবলে পঁচিশ বছর আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। আমি তখন ছিলাম ইনশিওরেন্স কোম্পানির চাকুরে। কিন্তু অভিনয়ের শখ আমার তরুণ বয়স থেকেই। একবার এক বন্ধু পরিচালকের অনুরোধে পড়ে একটা বাংলা ছবিতে অভিনয় করি। প্রচুর সুনাম হয়। সেই থেকেই আমি অভিনেতা। নামটা বদলে নিই প্রথমেই। অর্থাৎ সবটাই আমার মুখোশ। টাক পড়ে যাচ্ছিল দেখে ফিল্মে পরচুলা ব্যবহার করতে শুরু করি। একটা গোঁফও নিই সেই সঙ্গে। আমার এই চেহারাটাই দর্শক পছন্দ করে। কিন্তু আমার আসল চেহারা হল এই ছবির চেহারা। আপনাকে কথা দিয়েছিলাম চেহারা মিললে পুরস্কার দেব। এই নিন সেই পুরস্কার।'

সুখময় দেখল যে তার হাতে চলে এসেছে একটি কুড়ি হাজার টাকার চেক। এবার গণেশ মুৎসুদ্দি বললেন, 'শুনুন, আমি অভিনয় করি বলে যে আর্টের প্রদর্শনীতে যাই না তা নয়। আপনার এ মতিভ্রম হল কেন? আপনার পোর্ট্রেটে এত সুন্দর হাত—আপনি সেই ছেড়ে অন্য লাইনে গেলেন কেন?'

সুখময় আর কী বলবে, চুপ করে রইল।

'আমি আপনাকে বলছি,' বললেন গণেশ মুৎসুদ্দি, 'আপনি সমালোচকের কথা ভুলে যান। আপনি আবার পোর্ট্রেট আঁকতে শুরু করুন। আমার ধারণা আপনার হাত এখনো নষ্ট হয়নি।'

গণেশ মুৎসুদ্দি ছবিটা আবার মোড়কে পুরে নিয়ে বললেন, 'আমি তাহলে আসি। আমার অ্যাডভাইসটা অগ্রাহ্য করবেন না।'

সুখময় করেনি অগ্রাহ্য, এবং তাতে আশ্চর্য ফল পেয়েছিল। ১৯৯৫-এর ডিসেম্বরে তার আঁকা পোর্ট্রেটের প্রদর্শনীতে নতুন করে তার দক্ষতার সুখ্যাতি হল। আর সেই সঙ্গে ছবি বিক্রীও হল ভালো।